লেখক

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥লেখক॥

রবিবার। মধ্যাহ্নভোজন সমাধা ক'রে একটু ঘুমুবার উদ্যোগ করবো ভাবছি—এমন সময় বাইরে কে ডাকলে—সীমানাথ বাবু বাড়ী আছেন?

কে আবার রবিবার দুপুরে বিরক্ত করতে এল?

ছেলেকে ডেকে বললুম—নিয়ে আয় এখানে, আমি আর উঠতে পারচিনে। একটু পরে ছেলের পিছু পিছু চশমা চোখে ছিপছিপে ফরসা চেহারার একটি ছোকরা ঘরে ঢুকে বিনীত ভাবে প্রণাম করে বললে—আপনারাই নাম কি সীতানাথ বাবু—?

বললুম—বসুন, কোথা থেকে আস্‌চেন?

—আজ্ঞে, এই আপনার কাছেই এলাম। আজ আপনি সকালে—ওই ডাক্তারখানায় বসে ছিলেন, আমি আর দাদা নাইতে যাচ্ছি, দাদা বললেন—আপনি একজন লেখক। তখন তেল মেখেছিলুম, সে অবস্থায় আপনার কাছে যেতে সাহস করিনি। শুনলুম, আপনি শনি-রবিবারে এখানে আসেন, আজই আবার কলকাতা চলে যাবেন ওবেলা। তাই এখন দেখা করতে এলুম।

আসার উদ্দেশ্য শুনে মনটা প্রসন্ন হ'ল না। নিশ্চয়ই লেখা চাইতে এসেচে। এ পাড়াগাঁয়ের টাউনে কোনো কাগজের উৎপাত ছিল না তো জানি—তবে কি এখানেও কাগজ বার হ'ল?

ছোকরা বিনয়ে সঙ্কুচিত হ'য়ে আস্তে আস্তে চেয়ারে বসল, কিন্তু আমি লক্ষ্য করে দেখলুম, এতক্ষণ সে একবারও আমার মুখ থেকে চোখ ফেরায়নি—চশমার ভেতর দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে! একটুখানি চুপ করে থেকে ছেলেটি বলল—আপনার কাছে এলাম, যদি মনে কিছু না করেন তাহ'লে বলি।

—বলুন না?

—আমাকে একটু করে লেখা শেখাবেন। আমি এবার বাংলা নিয়ে বি-এ পাস করেচি। এখানকার স্কুলে চাকরি পেয়ে এসেচি। আমার দাদা এখানকার সাবরেজিস্ট্রার। আমার বড় ইচ্ছে আমি লেখক হই। কিছু কিছু লিখেছিলামও, সেগুলো এনেচি সঙ্গে করে—আপনার সময় হয়ে দেখবার?

আমার সম্মতি পেয়ে ছোকরা একখানা খাতা ভয়ে ভয়ে আমার হাতে দিয়ে বললে—আই-এ পড়বার সময় লিখেছিলুম। চার-পাঁচটা ছোট গল্প, কতকগুলো কবিতা আর গান আছে।

ও দেখি আমার মুখের দিকে আগ্রহ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমি কি মত দিই তাই শোনবার জন্যে। বললুম—মন্দ হয়নি, বেশ লাগল—তবে আপনার গানগুলো—ভালোই হয়েচে!

ছোকরা উৎসাহে ও আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে–আপনার ভালো লেগেচে?...আচ্ছা, গল্পগুলো? ওগুলোর মধ্যে কিছু দেখলেন?

বিশেষ কোনো ধরা-ছোঁয়া না দিয়ে বললুম–বেশ প্রমিস্ আছে। আপনার বয়েস কম, লিখতে লিখতে হবে।

ছেলেটি যেন আনন্দ কোথায় রাখবে ভেবে পেল না। বললে, দেখুন আমার অনেকদিন থেকে সাধ আমি একজন লেখক হবো। আমি বি-এতে বাংলা নিয়েছিলুম ব'লে বাড়ীতে সবাই বকে। আমার খুড়তুতো ভাইয়েরা বড় বড় চাকরি করে–তারা ভালো ইংরিজী জানে। তারা দাদার কাছে চিঠি লিখলে–ওকে এখন বাংলা ভুলতে বলো। বাংলা শিখে জীবনে কি হবে। এখন একটু ইংরিজির দিকে মন দিতে বলো, যদি কিছু উন্নতি করতে চায়। আমি এ সব লিখি ব'লে বাড়ীর কেউ সন্তুষ্ট নয়। আমি আবার বাড়ীর ছোট ছেলে কিনা। আমি যা লিখি দাদারা দেখতে চায়, লিখতে দেখলে বকাবকি করে। বলে, ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েচে। ও-সব লিখে মিথ্যে সময় নষ্ট করচে।

আমি মনে মনে তাদের খুব দোষী করতে পারলাম না একথা বলার জন্যে।

ছেলেটি আপন মনেই ব'লে যেতে লাগল–এখানে মাস্টারিটা পেয়ে গেলাম, গেজেট যেদিন বার হ'য়েছে, সেই দিনই চাকরি হ'ল আমার। এখানে এসে একা একা বেড়াই; একজনও এমন কেউ নেই যে, দুটো ভাল কথা বলে, কি সৎচর্চ্চা করে। সাহিত্য বিষয়ে কেউ খবরও রাখে না। বড় ব্যাক্ওয়ার্ড জায়গা। আপনার সন্ধান পেয়ে ভাবলুম ওঁর কাছে যাই, উনি আমায় লেখা-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারবেন। তাই এলাম। কারো কাছে উৎসাহ না পেয়ে আমি এমন দমে গিয়েচি, আজ এক বছর লিখিই নি।

তারপর ছোকরা আমায় বেশ বোঝাবার চেষ্টা করলে, সে বর্ত্তমান সাহিত্যের খবর রাখে বা সে সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ের মধ্যে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ইবসেন, শ', টলস্টয়, তরুণ-সাহিত্য, বৈষ্ণব কবিতা–ইত্যাদি হু হু করে মুখস্থ বিদ্যার মতো বলে গেল।

–আচ্ছা, তরুণ-সাহিত্যবাদের মধ্যে রামচন্দ্র সরকারের লেখা-সম্বন্ধে আপনার মত কি?

আমি বিপদে পড়ে গেলুম, তরুণ সাহিত্যবাদের বই কিছু কিছু পড়লেও রামচন্দ্র সরকারের লেখা-সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই। কিন্তু ছেলেটি যেমন আগ্রহের সঙ্গে এ-সব কথা পেড়েচে, তাতে বেশ বোঝা যায়, অনেক দিন পরে একটু উচ্চ বিষয়ে চর্চ্চা করতে পেরে ও খুব খুশি। হয়তো এমন শ্রোতা ওর অনেকদিন জোটে নি।

এ অবস্থায় তাকে নিরুৎসাহ করতে না পেরে রামচন্দ্র সরকার সম্বন্ধে একটা কাল্পনিক মত দেবার চেষ্টা করলুম। আমার কথা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনলে। বললে, আপনি ঠিক বলেছেন। আমার কি মনে হয় জানেন? ইবসেন বলেছেন–তারপর সে খানিকক্ষণ ধরে ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেক নাম অনর্গল

আবৃত্তি ক'রে, তাদের নানা মত উদ্ধৃত ক'রে নিজের একটা যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করলে—তার ভাবে মনে হল এ ধরনের কথা বলতেও সে বিশেষ আনন্দ পাচ্ছে—কথা বলতে বলতে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখে—বোধ হয় আমার মুখের ভাব বোঝবার চেষ্টা করে আমি তার তর্কের ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে কি ভাবছি।

আমি বললাম, এখানে কত দেয় আপনাকে?

—ঊনত্রিশ টাকা। এখন একরকম কুলিয়ে যায়, দাদার বাসাতে থাকি। কিন্তু দাদা বদলি হ'য়ে গেলে তখন মুশকিল হবে। আমার বাড়ীতে কিছু না দিলে তো চলবেই না—

—কেন, আপনার দাদারা রয়েচেন?

—আমার আপনার দাদা কেউ নেই। ওঁরা সব খুড়তুতো—জ্যেঠতুতো ভাই। আমার বাবা অন্ধ, আমি তাঁর একমাত্র ছেলে, আর একটি বোন, আমার ছোট, তার এখনও বিয়ে হয়নি। দাদারা সব যে যার পৃথক। এক বাড়ীতে থাকলেও এক অন্নে নেই।

ও বললে—আমার ছেলেবেলা থেকে সাধ যে, আমার লেখা কাগজে বেরোয়। যখন বড় বড় লেখকের লেখা দেখতাম, আমার ইচ্ছে হত একদিন আমিও এই রকম লিখব। আমার এক ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল কান্তি বসু—কলকাতায় তার সঙ্গে দেখা এই মাঘ মাসে। আমায় দেখালে "ভারতবর্ষে" তার একটা গল্প বেরিয়েছে। মনে মনে বললুম, বা রে। আমার এমন কষ্ট হ'ল, ওরা সব লেখক হ'য়ে গেল, ওদের লেখা ছাপা হচ্ছে, কত লোক পড়ছে, ভাবুন কত নাম বেরুবে!

সে খানিকক্ষণ জানালার বাইরে আকাশের দিকে কেমন একটা মুগ্ধ-আকুল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তারপর চোখ নামিয়ে বিষণ্ণ মুখে বললে—আর আমার কিছুই হ'ল না।

ওর আন্তরিকতা ও আগ্রহ আমার বড় ভালো লাগল। একটু অন্য ধরনের ছেলে বটে—হয়তো বা একটু মাথা খারাপ আছে। ও যতক্ষণ বসেচে, আমি কেবল লক্ষ্য করচি ওর মুখের ভাবের নানা রকম পরিবর্ত্তন। নির্ভরতা, ভয়, শ্রদ্ধা, আশা, আগ্রহ, স্বপ্ন, বিষণ্ণতা, বিভিন্ন ভাব ওর মুখে চমৎকার ফুটে ওঠে। খুব সাধারণ ধরনের লোকের এ রকম হয় না। পাথরগড়া মুখের মতো তাদের মুখ হয়—দৃঢ়, অপরিবর্তনীয়—ভাব-প্রবণতার বালাই তাদের নেই। ওকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললাম—আপনি এর পরে নিশ্চয়ই ভালো লিখতে পারবেন। এরই মধ্যে বেশ লেখা বেরিয়েচে আপনার হাত থেকে। এখন আপনার তো বয়েস কম, সারা জীবন পড়ে রয়েছে আপনার সামনে—আমার তো মনে হয়, কালে আপনি একজন ভালো লেখক হবেন—আপনার লেখা পড়ে আমরা এক সময় আনন্দ পাব।

ছোকরা সলজ্জ হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে বললে–কি যে বলেন। আপনারা আনন্দ পাবেন আমার লেখা থেকে।...আচ্ছা, আপনার মনে হয় সত্যি আমার কিছু হবে?

–কেন হবে না? না হবার তো কিছু দেখলুম না–খুব হবে।

–কান্তি বসু আমারই ক্লাসফ্রেণ্ড, আমারই মতো বয়েস–ও এরই মধ্যে নাম করে ফেলেচে। আচ্ছা, নাম করতে কতদিন যায়? নাম করবার নিয়ম কি?

আমার দুপুরের বিশ্রামটুকু একেবারেই মাটি হ'ল দেখচি। কি করব উপায় নেই–একে দু'চার কথায় বিদায় দেব ভেবেছিলুম, কিন্তু এর কথা ক্রমশঃ বেড়েই চলেচে, আবার কোথা থেকে নাম করবার নিয়ম এনে ফেললে। অথচ কেমন একটা অনুকম্পা হ'ল ওর ওপর, ভালো মনে কথার জবাব না দিয়েও পারলুম না। বললাম–তার কি কোন নিয়ম আছে, তা নেই। দু'চারটে ভালো লেখা বেরুতে বেরুতে ক্রমশঃ নাম বেরোয়। লোকে আপনার লেখা প'ড়ে যদি খুশি হয়, তবে নাম বেরুতে আর কি দেরি হবে?

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে আমার দিকে চেয়ে আনন্দসুরে বললে–অনেকদিন থেকে আমার ইচ্ছে কোন লেখকের সঙ্গে আলাপ করি। কলকাতায় থাকতে একবার দেবব্রত মুখুয্যের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন দেবব্রত বাবুর 'অপরিণত' বইটা সবে বেরিয়েচে–সারা রাত ধরে জেগে বইখানা পড়লাম, এমন ভালো লাগল আর এমন একটা ইন্‌স্পিরেশন্ পেলাম–তার পরদিন আমিও একখানা ওই রকম নভেল লিখব ভাবলাম। আট-দশ চ্যাপ্টার লিখেও ফেললাম। কান্তিকে দেখাতে গেলাম, সে বললে এর প্লট, ভাব, ভাষা, সব নাকি দেবব্রত বাবুর বইখানার মতো হচ্চে। আমার ঐ এক দোষ–যখন যে বই পড়ি, লিখতে বসলে সেই বইখানার মতো প্লট আর ভাষা হ'য়ে যায়। তা সেদিন দেবব্রত বাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল না, তিনি ওপর থেকে বলে পাঠালেন তিনি বড় ব্যস্ত।

তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে তার একটা গান আবার উল্টে পড়তে লাগলাম। সে হাসি-হাসি মুখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ও গানটা সম্বন্ধে আমার প্রশংসার পুনরাবৃত্তি, অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে শুনলে–জীবনে বোধ হ'ল এই সর্ব্বপ্রথম নিজের লেখার প্রশংসা শুনচে। কথাবার্ত্তার মধ্যেও একবার ঘরের চারিধারে আর একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে খুশির সুরে বললে–আমি কোন লেখকের এত কাছে ব'সে কখনো গল্প করিনি। এত বেশীক্ষণ আমার সঙ্গে কেউ কথাও বলেনি।

আর মিনিট কুড়ি পরে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাতা-পত্র গুটিয়ে নিয়ে উঠল–ভাবলে বোধ হয় আর বেশীক্ষণ থাকলে আমি পাছে বিরক্ত হই।

দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে কি ভেবে আবার বসল, ভয়ে ভয়ে বললে–একটা কথা বলব? কথাটা বলতে সাহস হয় না। অত কম টাকায় কি আপনি রাজী হবেন? আমি আপনাকে দশ টাকা ক'রে মাসে মাসে দিলে, আমাকে লেখা শিখিয়ে দেবেন?

ওর এই কথাটায় কেমন একটা কষ্ট হ'ল ওর জন্যে। মাত্র ঊনত্রিশ টাকা মাইনে থেকে আমায় দশ টাকা দিতে রাজী–বাকি ঊনিশ টাকাতেই এখানকার ও বাড়ীর খরচ চালাতে রাজী–লেখক হবার এতই সাধ।

আমি তাকে বললাম–তার কোন টাকাকড়ি লাগবে না। আমি সব ছুটিতে এখানে আসিনে, যখন আসব, তখন আমার দ্বারা যতদূর উপকার হয়, খুশির সঙ্গে করব।

সে মহা আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে খাতা-পত্র বগলে নিয়ে প্রণাম ক'রে ঘর থেকে বার হ'য়ে গেল। বাইরে গিয়ে আবার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বললে–তা হ'লে আবার দেখা হবে? না হবার কিছু দেখলেন কি?

–হবে নিশ্চয়ই, না হবার কিছুই দেখিনি। তবে সাধনা চাই।

ভগবান আমায় যেন ক্ষমা করেন–এই মিথ্যে বলবার জন্যে। আমি কেমন ক'রে ওর মুখের উপর বলবো যে, ওর লেখার মধ্যে আমি কিছুই পাইনি–ওর গল্প, কবিতা নিতান্ত বাজে হ'য়েচে, বিশেষ কোনো ক্ষমতার অঙ্কুরও তার লেখার মধ্যে কোথাও নেই। মিথ্যা যেখানে মানুষকে সুখী করে, সেখানে নিষ্ঠুর সত্য ব'লে কিইবা লাভ?

॥সমাপ্ত॥